বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৭৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১

তৃতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৪২৪ এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0178-7

ANONDOMOTH
A novel by Bankim Chandra Chattopadhyay
Introduction by Masuduzzaman
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh
Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com
Price : Tk. 130.00 only

ভূমিকা

১

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বাণিজ্যপুঁজির প্রভাবে এ-দেশে যখন নগরায়নের বিকাশ ঘটে, সৃষ্টি হয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী, ঠিক তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। ঔপনিবেশিক সেই শাসনপর্বে 'মধ্যযুগীয় গ্রামগুচ্ছের প্যাটার্ন' ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা 'আত্মাভিজ্ঞান সন্ধানী' মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ভেতর দিয়ে উদ্বোধন ঘটতে থাকে দেশচেতনার, ভারতের যাত্রা শুরু হয় আধুনিকতার দিকে। ঐতিহাসিকভাবে স্বচিহ্নিত দ্বিধারক্তিম সেই কালপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সচেতনভাবে পাশ্চাত্য উপন্যাসরীতিকে স্বীকরণ করে বৃত হন সাহিত্যের আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম উপন্যাস রচনায়। বাংলা সাহিত্যে এর আগে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত নক্‌শাধর্মী কিছু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও পূর্ণাঙ্গ কাহিনীরস পরিবেশনের কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকেই নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের জনক বলে অভিহিত করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নতুনকালের পাঠক *শকুন্তলা, সীতার বনবাস, আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা* বা *কাদম্বরী*র পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতে খুঁজে পেলেন রোমান্সের রসঘন আত্মমুকুরিত রূপ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্যেই বলেছেন, 'উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্তের সকল স্ববিরোধ, সংকোচ, সংশয় এবং বেদনার মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র'। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবির্ভাবপটটিকে রবীন্দ্রনাথ আরও চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্র আনলেন সাতসমুদ্র পারের রাজকুমারকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি *ঠেকালেন* সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত, লায়লা-মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখে কে?

রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তটি ছিল সত্যিকার অর্থেই রাজসিক, অনবচ্ছিন্ন ও চমকপ্রদ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম শিল্পসফল উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি বাঙালি সাহিত্যপাঠকের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সর্বশেষ উপন্যাস *সীতারাম* (১৮৮৭) রচনার মধ্য দিয়ে পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে জীবনব্যাপী সৃজনীসাধনা। তেইশ বছর (১৮৬৫-১৮৮৭) স্থায়ী উপন্যাস রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছেন চৌদ্দটি উপন্যাস; কালানুক্রম অনুসারে *আনন্দমঠ*-এর (১৮৮২) স্থান

দ্বাদশতম। উল্লিখিত তিনটি উপন্যাস ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে : *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৪), *রাধারাণী* (১৮৮৬), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২) এবং *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম চব্বিশ পরগনার কাঁটালপাড়া গ্রামে। ডেপুটি কালেক্টর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র তিনি। যাদবচন্দ্র ফারসি ও ইংরেজিতে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করে (১৮৫৮) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ তেইশ বছর কর্মজীবন সম্পন্ন করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিয়ে করেছিলেন দু-বার : ১৮৪৯ সালে মোহিনী দেবীকে, কিন্তু মাত্র দশ বছর পর এই স্ত্রী মারা যান। দ্বিতীয়বার ১৮৬০ সালে বিয়ে করেন রাজলক্ষ্মী দেবীকে।

বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ছাত্রজীবনেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যচর্চা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত হয় তাঁর বেশকিছু গদ্য-পদ্য। কিন্তু তাঁর সচেতন সাহিত্যচর্চার শুরু একটি ইংরেজি উপন্যাস রচনার মাধ্যমে। *Rajmohan's Wife* (১৮৬৪) শীর্ষক এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'ইন্ডিয়ান ফিল্ডে' প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাইকেলের মতোই ইংরেজিভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও বঙ্কিমের সাহিত্যমানস তাতে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়নি, ১৮৬৩-৬৪ সালে *দুর্গেশনন্দিনী* রচনার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার পাশাপাশি লিখেছেন সমাজসমস্যামূলক তীক্ষ্ণ লঘু গদ্য (*লোকরহস্য* ও *কমলাকান্তের দপ্তর*), উপস্থাপন করেছেন ধর্মীয় বা ধর্মাশ্রিত মহাকাব্য/লোককাহিনীর বিচারমূলক দিগ্‌দর্শী ব্যাখ্যান (*কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম*), বিজ্ঞানধর্মী নিবন্ধ (*বিজ্ঞানরহস্য*), ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাসবিষয়ক নানা প্রবন্ধ (*বিবিধ প্রবন্ধ*), কবিতা ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার ইতিহাস আসলে বাঙালির উন্মেষকালের চিৎপ্রকর্ষের ইতিহাস। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যেমন, তেমনি লঘু রচনা বা ধর্মকেন্দ্রিক রচনার মাধ্যমে বাঙালির ভাবলোকে ও চিন্তালোকে প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকই শুধু নন — চিন্তাবিদ, পথপ্রদর্শক, এমনকি মুক্তস্বাধীন ভারতদ্রষ্টাও বটে। *আনন্দমঠেই* (১৮৮২) এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে।

২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত উপন্যাস *আনন্দমঠ;* শিল্পশৈলীর দিক থেকে যতটা নয়, তার চেয়েও বেশি প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর জন্যে।

জীবনান্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মউদ্ভাবিত তত্ত্বের অনুসরণে যে-তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন, *আনন্দমঠ* তার একটি। অন্য দুটি উপন্যাস হচ্ছে *দেবীচৌধুরাণী* এবং *সীতারাম*। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলনবাদ — এই তিনটি প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে উপর্যুক্ত ত্রয়ী আখ্যায়িকার সৃষ্টি। উল্লিখিত বিষয়বস্তুর কারণে *আনন্দমঠ*-কে অনেকেই 'রাজনৈতিক উপন্যাস' এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে 'জাতিস্রষ্টা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হিন্দু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশ-জিজ্ঞাসার সূচনা হিসেবে উপন্যাসটির ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রকাশের শতবর্ষ পরেও তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। বঙ্কিমের এই ভাবনাসূত্রের মধ্যেই অবশ্য লুকিয়ে আছে *আনন্দমঠ*কেন্দ্রিক বিতর্কবীজ। এ-প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে উপন্যাসটির প্রেক্ষণীপট ও কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

*আনন্দমঠে*র কাহিনী চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত। ঘন নিবিড় অরণ্য, মন্বন্তর, আর্থ-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং এসবের প্রেক্ষাপটে দেশচেতনায় উদ্দীপ্ত সন্তানদলের আবির্ভাব প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সন্তানদলের দীক্ষিত হবার বর্ণনা, তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, আত্মসংযম ও সংসারযাপনের চিত্র। তৃতীয় ও সর্বশেষ খণ্ডের বিষয় সন্তানদলের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিশাল রাজসৈন্য এমনভাবে 'নিষ্পেষিত' হল যে 'ওয়ারেন্ হেস্টিংয়ের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না'। কিন্তু হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল না। মুসলমান শাসকের পরিবর্তে 'ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত' হবে বলে তিনি *আনন্দমঠে* 'সন্তানবিদ্রোহ' ঘটিয়েছেন।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, *আনন্দমঠে*র গল্পের বাঁধুনি বেশ শিথিল। পরিচিত গার্হস্থ্য জীবনের ছবি এতে অনুপস্থিত। নারী-পুরুষের চরিত্রগুলো একরৈখিক— ঔপন্যাসিকের নিজস্ব মতাদর্শের বাহকমাত্র; রক্তমাংসে গড়া নয়। এর ঘটনাবলিও 'সুদূরে স্থাপিত'। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন *আনন্দমঠে*র কাহিনীর উৎস বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, যা তিনি পেয়েছেন গ্লিগের *Memoirs of the life of Warren Hastings* এবং ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের *Annals of Rural Bengal* থেকে। উপন্যাসে বর্ণিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ ছবিটিও হান্টারের উল্লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। এতসব ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষণীপটে *আনন্দমঠ* রচিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই।' উপন্যাসটির বিষয়বস্তু লক্ষ করলে অবশ্য এর প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। কোনো সন্দেহ নেই ইতিহাসভিত্তিক হলেও এটি একটি রাজনৈতিক আইডিয়াপ্রধান উপন্যাস। এই আইডিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে 'অকুণ্ঠ দেশপ্রেম'। হুমায়ুন কবির বলেছেন, এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভূত জাতীয়তাবাদ (nationalism) ও দেশপ্রেমকে (patriotism) কেন্দ্র করে। তাঁর মতে *আনন্দমঠে*র বিষয়বস্তু হচ্ছে 'ঐতিহাসিক কালাসঙ্গতি' (historical anacronism), যা সমকালের বিকাশমান মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই মূর্ত করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠে*র মাধ্যমে

বাঙালিকে যে-দেশানুরাগ ও জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে সে-ধরনের কোনো জাতীয়তাবাদ ভারতীয় ইতিহাসে লক্ষ করা যায় না। একে বলা যায় 'দেশভক্তি' বা 'স্বদেশপ্রীতি'। *আনন্দমঠে* এই দেশচেতনারই তত্ত্বমূর্তি নির্মাণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই দেশতত্ত্বের মূলকথা হল জাতি-অভিমান সৃষ্টি, প্রাণবিসর্জন বা আত্মত্যাগে ব্রতী হওয়া। সকল বাঙালিকে উল্লিখিত দেশব্রতে উদ্বুদ্ধ করে বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠে* একটি অখণ্ড চেতনাসূত্র বা সমরূপতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। *আনন্দমঠে* জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের এই-যে ধারণা আমরা পাই, তা বঙ্কিমমানসেরই বিশিষ্ট প্রতিচ্ছবি, পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নয়।

আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মাতৃমূর্তির তিনটি রূপ দেখিয়েছে : মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন এবং মা যা হইবেন। দেবীমূর্তির এই ত্রিকালধর্মী ত্রয়ী পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের অতীতের জন্য গর্ব, বর্তমানের জন্য বেদনা ও ভবিষ্যতের জন্য আশার প্রতীক। এই আশা বাস্তবায়িত হওয়ার পথ হচ্ছে বিপ্লব সংগঠন, ইন্দ্রিয়জয়ী চরিত্র, বর্ণবৈষম্য লুপ্তি, ঐক্যবোধ ও শক্তিচর্চা। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এসব নিয়ে কেউ গভীরভাবে ভাবেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশচেতনায় এই ভাবনা নতুন মাত্রা যোগ করে। উপনিবেশের অধীন ভারতবাসীকে তিনি দেশপ্রেমে ও স্বাধীনতা অর্জনের কঠিন ব্রতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য বা মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল হিন্দু জাতি। এ কারণেই *আনন্দমঠে* তিনি মুসলমান-রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছেন এবং সূচনা কল্পনা করেছেন ইংরেজ-শাসনের।

বঙ্কিমের এই স্বদেশচিন্তা যেমন স্ববিরোধিতায় পূর্ণ, তেমনি তা সূচনা করেছে এমন এক বিতর্কের, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কালপর্বের বুদ্ধিবৃত্তিক মানসদ্বন্দ্বের সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় :

> এই দ্বন্দ্বের একদিকে পরাধীনতার গ্লানি, অন্যদিকে ইংরেজ-শাসনের সুফল সম্বন্ধে প্রত্যয়; একদিকে ইংরেজ-শাসনের শোষণনীতি, অন্যদিকে নবাবী আমলের অরাজকতার স্মৃতি; একদিকে ইংরেজ-শাসনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধের জাগরণ, অন্যদিকে মোগলে-মারাঠায় শিখে-জাঠে...ভারতব্যাপী গজকচ্ছপী কাণ্ড চলেছে; একদিকে সিপাহী বিদ্রোহের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান, অন্যদিকে তার নায়ক লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া টোপি সম্বন্ধে গৌরববোধ; একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে নূতন আগ্রহ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ —বিচিত্র দ্বন্দ্বে দোলায়িত ঊনবিংশ শতকের মন।

নব্যহিন্দুত্বের পুরোধা বঙ্কিম মুসলমান-অপশাসনের বিপরীতে ইংরেজ-শাসনব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ করেছিলেন ভারতীয়দের পরিত্রাণ লাভের উপায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এটাই ছিল প্রধান মানসবৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে অধিকাংশ ভারতীয় ভাবুক লেখক রাজনীতিক এই দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত দু-তিন দশক ধরে এই সময়ের বেশকিছু ভাবুক—রাষ্ট্রচিন্তাবিদ কিংবা সমাজবিদ—'ভারতীয়তা'র খোঁজ করতে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখক-ভাবুকগণ যে কী ধরনের দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তার চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয়তার অনুসন্ধানে লিপ্ত এরকমই একজন—পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম তিনটি সময়স্তরে বিভক্ত ছিল : প্রস্থান পর্ব (moment of departure), কৌশলী পর্ব (moment of manoeuvre) এবং অর্জন পর্ব (moment of arrival)। বঙ্কিমচন্দ্রের উন্মেষ ঘটে প্রথম পর্বে। এই পর্বে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণ মনে করেছেন যে, প্রতীচ্যের উন্নত বস্তুবাদী সাংস্কৃতিক উপাদানের (বস্তুবাদিতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) সঙ্গে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদী ধর্মীয় ঐশ্বর্যের সংযোগ ঘটলেই ভারতীয় সমাজে প্রকৃত আধুনিকতার উন্মেষ ঘটবে। ওইসব ভাবুকের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারত এভাবে আধুনিক না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমের সঙ্গে যুক্ত থাকাই সমীচীন; স্বাধীনতার কোনও প্রয়োজন নেই।

তবে এই ভাবনার সবচেয়ে বড় প্যারাডক্স হচ্ছে, অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানের নামে ভারতীয় ভাবুকগণ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুঐতিহ্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। পুনর্জাগরণবাদী এই ধারণাটি-যে বিশেষ ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় একধরনের জাতিগত বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠই* তার প্রথম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে। উপন্যাসটির জাতীয়তাবাদী ভাবনার মধ্যে তাই মুসলমানদের কোনও স্থান হয়নি, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মহেন্দ্রকে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে সত্যানন্দ বলেছিলেন : 'আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিধন করিতে চাই' (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। এই সত্যানন্দ উপন্যাসের অন্তিমপর্বে বললেন :

> সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।
>
> তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চলো।
>
> শুনিয়া সত্যানন্দ মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?"
>
> তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।" (*চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ*)

তবে 'সনাতন ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত হলে এই ইংরেজ-শাসনেরও অবসান ঘটবে। একমাত্র 'জ্ঞানলাভ', অর্থাৎ ইউরোপীয় আলোকপর্বের (Age of Enlightenment) যুক্তিবাদী চিন্তাকে অবলম্বন করলেই কেবল ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারে বলে উপন্যাসটির শেষে ইঙ্গিতগর্ভ সংলাপ আছে। সত্যানন্দ তাই যখন প্রশ্ন করলেন কেন তাদের 'নৃশংস যুদ্ধকার্যে' নিযুক্ত করা হল, তখন মহাপুরুষ জানালেন : 'ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।'

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে প্রখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ন-টি সংখ্যায় (চৈত্র ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ পর্যন্ত) *আনন্দমঠ* প্রথম প্রকাশিত হয়। সাময়িকপত্রে প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় *আনন্দমঠে*র পাঁচটি সংস্করণ। প্রতিটি সংস্করণ প্রকাশের সময় তিনি উপন্যাসটির কোনও-না-কোনও পরিবর্তন সাধন করেছেন। অনেকের ধারণা *আনন্দমঠে*র পঞ্চম সংস্করণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব কথা আছে, উপন্যাস লেখার সময় সেইসব স্থানে ইংরেজের কথা লিখেছিলেন। কিন্তু পরে রাজরোষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজ' কেটে 'যবন' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। যারা তাঁকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিপন্ন করতে চান, তারা এই যুক্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম মুদ্রিত পাঠেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনসব বর্ণনা আছে, যা সহৃদয় পাঠকের মনে আঘাত হানতে পারে :

> সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, 'ইংরেজ মুসলমান একত্রে পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্ত কণ্ঠে হরি হরি বলো।' গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, 'মুই হেঁদু'।

এজন্যেই বলা যায় *আনন্দমঠে* সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইংরেজকে উপস্থাপন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, মুসলমানের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিদ্বেষ, আর হিন্দুকে দেখেছেন সমালোচনার চোখে। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, নব্যকালের চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে 'বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতা এইখানে যে, সৃষ্টিধর্মী উৎকৃষ্ট চিন্তা তাঁর মনে যতখানি জায়গা পেল তার চাইতে বেশি জায়গা পেল হিন্দু-ঐতিহ্যগর্ব'। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

> সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু মানুষ হিসেবে এবং তার তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি হিন্দু হিসেবে। অতএব বঙ্কিমসাহিত্য হচ্ছে, মানুষ-বঙ্কিমের হিন্দু-বঙ্কিমে ক্রমপরিণতির ইতিহাস ও আলেখ্য।

এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার স্বরূপ কী ছিল, আলোচনা করে নেওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যখনই রাষ্ট্রচিন্তা শুরু করেন তখনই তাঁর দৃষ্টি সরে আসে জটিল-কুটিল যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর রাষ্ট্রের মূলে রয়েছে যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, জয়। *আনন্দমঠেই* দেখি, রাষ্ট্র মাটি ও মানুষ নিয়ে নয়; তার কেন্দ্রে আছেন এক ত্রিনয়নী, রক্তপিপাসু, সংহারমুখী, অস্ত্রধারিণী দশহস্তা দেবীমূর্তি। উপন্যাসের একজায়গায় আবার মুসলমানের মসজিদ ভেঙে রাধামাধবের মন্দির গড়ে তুলবার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এতে এমন এক দেশাত্মবোধের কথা বলা হল, যা ভারতীয় মুসলমানের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না।

ফলে, না তারা দেবীবন্দনা করতে পারলেন, না মুসলমানবিদ্বেষী কথা অগ্রাহ্য করতে পারলেন। এই রাষ্ট্রচেতনা, কোনও সন্দেহ নেই, সম্পূর্ণই হিন্দুরাষ্ট্রবাদ।

তবে উল্লিখিত কারণে বিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে *আনন্দমঠ* সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। এই উপন্যাসের মাধ্যমেই ভারতীয়রা প্রথম পেয়েছিল দেশব্রতের দীক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের *ধর্মতত্ত্বের* অন্তিম উক্তি— সংক্ষিপ্ত নির্যাসবদ্ধ বাণী, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই দ্বিধারক্তিম কালে দেশব্রতী ভাবুকের উত্তরনির্দেশ : 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।' সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *আনন্দমঠের* মধ্য দিয়ে উত্তরপুরুষের গ্রহণ করবার কথা এটাই। *আনন্দমঠ* উপন্যাসের সার্থকতাও এইখানে।

অগ্রহায়ণ ১৪০৮

মাসুদুজ্জামান
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপক্রমণিকা

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নিচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখনও মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য; তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোনও শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কী?'

প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

'আর কী আছে? আর কী দিব?'

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি।'

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লিতে পল্লিতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নিচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই-বা কী, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভালো হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাহিল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই-এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহির জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে-কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোত-জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার

পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না-খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনাআপনি পচে। যে-গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে-গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী-নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, 'এরূপে কদিন চলিবে?'

কল্যাণী বলিল, 'বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যত দিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া শহরে যাইও।'

মহেন্দ্র। শহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায়-বা কেন এত দুঃখ দিই। চলো না এখনই যাই।

পরে দুইজনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল।

ক। শহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয়তো এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকলপ্রকারে কর্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, 'এই বাড়ি বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা-যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।'

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুইজনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চলো, এখনও বন্ধসন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা তো সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে তো গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে তো গোরু নাই।'

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, নাহয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু তো ইহারা দুইজন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, 'পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেরা ফিরিতেছে,

শুধু-হাতে যাওয়া উচিত নয়।' এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, 'যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধরো। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।' এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, 'তুমি আবার কী হাতিয়ার লইবে?'

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কী হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মতো, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলাগাছের ছায়ায়, কখনও খেজুরগাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক-একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে হাতে পায়ে কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুইজনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী-কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে তো মনুষ্য নাই; বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকহাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, 'একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাকো, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।' এই বলিয়া একটি মাটির কলসি হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসি অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়অন্ধকার কুটির মধ্যে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোনও শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, নাহয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কী ছায়ার মতো দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মতো কী আসিয়া

দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর-একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর-একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মতো ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসি করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, ইতস্তত অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষে স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল; কোনও উত্তর, কোনও সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে-বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্যের ন্যায় সে-বনের সৌন্দর্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না-থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কী করা যায়—যে-কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, 'আমরা সোনা-রূপা লইয়া কী করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।' একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। 'চাল দাও,' 'চাল দাও', 'ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-রূপা চাহি না।' দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে-অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই-একজনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই-এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, 'শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এসো ভাই আজ এই বেটাকে খাই।' তখন সকলে 'জয় কালী!' বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। 'বম কালী! আজ নরমাংস খাইব!' এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্তিসকল অন্ধকারে খলখল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি শোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি

জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ি, খর্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প-অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃত শবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর-একজন বলিল, 'রাখো, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌নো মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব; এসো, ওই কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।' আর-একজন বলিল, 'যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।' তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়া ছিল, সেইদিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া 'মার মার' শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চিৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া অনেক দূর-বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চিৎকার করিয়া চারিদিক্‌ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, 'কোথায় তুমি! যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!' সেই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসাদে, কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে, দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গায়িতেছেন—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

ক্রমে গীত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলি প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্ধস্ফুট বনান্ধকারমিশ্রিত চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্তি! অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। পুরাণতত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্য বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকাসকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি কুঠরীমধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে আবার দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন, মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিতলোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, 'মা, এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে—তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।'

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্বাদ করিয়া, গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া, সেই

জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন, 'মা, কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।' কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ 'আমি যতক্ষণ না আসি, কোনো চিন্তা করিও না' বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ানো সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল, প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, 'মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।'

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, 'কী বলিবে?'

তখন কল্যাণী বলিলেন, 'আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোনো বাধা আছে। আমি খাইব না।'

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, 'কী বাধা আছে আমাকে বলো—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কী কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না? আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না-খাইলে বাঁচিবে কী প্রকারে?'

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, 'আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ-পর্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিংবা তাঁহার ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কী প্রকারে খাইব?'

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

কল্যাণী বলিলেন, 'তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।' তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া, কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?' কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে-অগ্নিতে দুগ্ধ তপ্ত হইয়াছিল, অবনতমুখে তাহাতে কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'তুমি আমার বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।' কল্যাণী বলিলেন, 'একটু জল এখানে আছে কি?' ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পুরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।' ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, 'আমি অমৃত পান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।' ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, 'তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কী আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। গাছের মাথাসকল চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সর-সর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো হইয়া তর-তর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কী শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোনও শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্মর শব্দ। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নিচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কী শব্দ হইল বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেইদিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নিচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বিটপরিচ্ছেদে নিপতিত জোছনায় তাহাদের মার্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে। এমন দুইশত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কী একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোনো শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন; অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন; যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন; পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একজনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবাপুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে —সর্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, 'ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোনো সংবাদ রাখো?'

ভবানন্দ তখন বলিল, 'মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী-কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—'

এই পর্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল?'

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধহয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয়? আমরা আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, 'চোরের হাত হইতে আমি তাহার স্ত্রী-কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী-কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্যোদ্ধার হইবে।'

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোনো ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেইদিকেই চলিলেন। কিছুদূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ি ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহি চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালির প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কী প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালি কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না-খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেননা, মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ি বোঝাই হইয়া সিপাহির পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশজন সশস্ত্র সিপাহি গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গিন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ একজন গোরা। গোরা সর্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহিরা পথে চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজনার গাড়ি ও সৈন্যসামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহি ও গোরুর গাড়ি কর্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি সিপাহিরা তাঁহার গা ঘেঁষিয়া যায় দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া—তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একজন সিপাহি বলিল, 'এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।' মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল এবং 'শালা—চোর—' বলিয়াই সহসা এক ঘুসা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্তহস্তে কেবল ঘুসাটি ফিরাইয়া মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশি হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঘুসাটি খাইয়া সিপাহি মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন-চারিজন সিপাহি আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল, এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহিকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন; বলিলেন, 'শালাকো পাকড়লেকে শাদি করো।' সিপাহিরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কীপ্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে, বিবাহ করিতে হইবে না, বিবেচনায় তিন-চারি জন সিপাহি গাড়ির গোরুর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতেপায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়িতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ

করিয়াই-বা কী হইবে? স্ত্রী-কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোনও ইচ্ছা ছিল না। সিপাহিরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ির চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহিরা খাজনা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

সে-সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তাসকল ছিল না। নগরসকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সম্রাটনির্মিত অপূর্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন হইতে নগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। এইজন্য পথে সিপাহিদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহিদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহিদিগকে পাস দিলেন। একে সিপাহিদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে একজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাস দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর-একজন ডাকাত। অতএব তৎক্ষণাৎ সিপাহিরা তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কেন বাপু?'

সিপাহি বলিল, 'তোম্ শালা ডাকু হো।'

ভবা। দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন পরা ব্রহ্মচারী আমি, ডাকাত কি এইরকম?

সিপাহি। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতি করে। এই বলিয়া সিপাহি ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া, টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে-অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, 'প্রভু, কী করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।'

সিপাহি ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'লেও শালা, মাথে পরে একঠো মোট লেও।'

এই বলিয়া সিপাহি ভবানন্দের মাথার উপর একটা তল্পি চাপাইয়া দিল। তখন আর একজন সিপাহি তাহাকে বলিল, 'না; পলাবে। আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ির উপর সেইখানে বেঁধে রাখো।' ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল যে, কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ, মাথার তল্পি ফেলিয়া দিয়া, যে-সিপাহি তল্পি মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহি ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ির উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহিরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ির চাকার কচকচ শব্দ হইতে লাগিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র

মাত্র শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে বলিলেন, 'মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি, তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা করো। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ির চাকার উপর রাখো।'

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামতো কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ির চাকার নিকটে একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ওইরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ির উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া, ব্রহ্মচারী চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহিরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নিচে একটা ঢিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, 'আরও এক শালা ওই। উহাকে ধরিয়া আনো। মোট বহিবে।' তখন একজন সিপাহি তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহি ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহি তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, 'উহার মাথায় মোট দাও।' সিপাহি তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ির সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। 'এই শালা হাওলদারকো মারা' বলিয়া একজন সিপাহি মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া, পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহির মাথায় মারিল, সিপাহির মাথা ভাঙিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সে সময়ে 'হরি! হরি!' হরি!' শব্দ করিয়া দুইশত অস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহিদিগকে ঘিরিল। সিপাহিরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, সত্বর গাড়ির কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না। তখনই সিপাহিরা চারিদিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ির উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে 'হরি হরি' শব্দ করিতেছে এবং 'সিপাহি মার, সিপাহি মার' বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহিরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া, গাড়ির নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহিরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে-ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, 'ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।'

জীবানন্দ বলিল, 'ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।' অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহির প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেননা, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আপনি কে?'

ভবানন্দ বলিল, 'তোমার তাতে প্রয়োজন কী?'

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান!

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে-না-ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, 'এ যে কুকাজ—ডাকাতি।' ভবানন্দ বলিল, 'হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।'

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কী উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভালো।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'সে কী?'

ভবানন্দ সে-কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কীরকম দস্যু?

দশম পরিচ্ছেদ

সেই জোছনাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর গর্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্তি আর নাই। এখনই যে

গর্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে-মূর্তি আর নাই। যেন জোছনাময়ী, শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নদ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
*শস্যশ্যামলাং মাতরম্।**

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে—জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতা কে?'

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন—

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বলিল, 'এ তো দেশ, এ তো মা নয়—'

ভবানন্দ বলিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা,—'

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, 'তবে আবার গাও।'

ভবানন্দ আবার গাহিলেন—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

---

* মল্লার—কাওয়ালী তাল।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কারা?' ভবানন্দ বলিল, 'আমরা সন্তান।'

মহেন্দ্র। সন্তান কী? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভালো—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহে। এই তো গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার?

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কী অধিকার?

মহে। রাজার রাজভোগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কী?

মহে। তোমরা সিপাহির তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহি দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহে। ভালো করে দেখ নি, একদিন দেখিবে।

ভবা। নাহয় দেখলাম, একবার বই তো আর দুবার মর্‌ব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কী?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মতো মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল দুধ-ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি তো আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লি, কাশ্মির—কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না-পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্

দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দস্যু গায়িল—

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে!
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।

মহে। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি একা।

ভবা। কেন, এখনি তো দুশো লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান।

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহে। নাহয় দশ-বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের ক-জন ফৌজ ছিল?

মহে। ইংরেজ আর বাঙ্গালিতে?

ভবা। নয় কিসে? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে ইংরেজ মুসলমান এত তফাৎ কেন?

ভবা। ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবত খুঁজিয়া বেড়ায়—ধর, তারপর ইংরেজদের জিদ আছে—যা ধরে, তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহিরা মাহিয়ানা পায় না। তারপর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা একজায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দুইশো জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীসুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীসুদ্ধ গোলা দেখিলে তো একটা ইংরেজ পলায় না।

মহে। তোমাদের এসব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী-কন্যা আছে।

মহে। তোমরা সে-সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে, আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখনো ছিল না বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে?

মহে। আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চলো, তবে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিবে চলো।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল; ভবানন্দ আবার 'বন্দে মাতরম্' গায়িতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভালো ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গায়িল—দেখিল যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিল, 'যদি স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।'

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী-কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, 'আনন্দমঠে', সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোনো কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কী কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।' এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তারপর বলিলেন যে, 'চলো, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।'

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষ প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কী আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা

শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিমান রাগরাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকল দেখিতে পাইতেছ?' মহেন্দ্র বলিল, 'পাইতেছি।'

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কী আছে দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'আমরা যাঁর সন্তান।'

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বলো—বন্দে মাতরম্। এখন চলো, দেখিবে চলো।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে?'

ব্রহ্ম। মা—যা ছিলেন।

ম। সে কে?

ব্র। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্যপশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই পথে আইস।' ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে-আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু-পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'দেখ মা যা হইয়াছেন।'

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, 'কালী।'

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দরদর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাতে খেটক খর্পর কেন?'

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বলো, বন্দে মাতরম।

'বন্দে মাতরম' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'এই পথে আইস।' এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্মরপ্রস্তরনির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন—

'এই মা যা হইবেন। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—' বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। 'দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এসো, আমরা, মাকে উভয়ে প্রণাম করি।' তখন দুইজনে যুক্তকরে ঊর্ধ্বমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—

সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?'

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।'

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায়?'

ব্রহ্ম। চলো—দেখিবে চলো।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে?

ম। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথায় বিদায় দিবে?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এ মহামারীর সময় আর কোথায়-বা স্থান পাইব?'

ব্রহ্ম। যে-পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে পাইবে। কল্যাণী এ পর্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি, তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোনও পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমনপূর্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রের লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেননা, তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে

হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেননা, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর চোখ মুছার ধুম পড়িয়া গেল। যতবার চোখ মুছা যায়, ততবার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর অনুচর যে-খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন-ব্যঞ্জন পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে-গাছে যে-ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না। এইজন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্য ফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসীঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তারপর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রম দূর করিলেন। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, 'বাড়িতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ির অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চলো, বাড়িতেই ফিরিয়া যাই।' মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া, কোনওপ্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন গতক্রম হইয়া, কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে তো বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গোঁসাই, হাসো কেন?'

গোঁসাই বলিল, 'তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কী প্রকারে?'

মহেন্দ্র। যে-প্রকারে হউক, প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ তো বাহির হইতে পারিতেছ না কেন?' এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বলিলেন, 'তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?'

বৈষ্ণব বলিল, 'আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোনো সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।'

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, 'আপনি সন্তান?'

বৈষ্ণব বলিল, 'হ্যাঁ, আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।'

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নাম কী?'

বৈষ্ণব বলিল, 'আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।'

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিল; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছুদূরে সবৃক্ষ প্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর একদিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মতো কালো। দুইপাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি! বিপদ্ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?'

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'আমি আর আপনার নহি—আমি কী করিব বুঝিতে পারি না।'

ক। কেন?

মহে। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুনো। এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, 'আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ্ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া কী করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল, বলিতে পারি না—কিন্তু আমি কাল শেষরাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কী পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙা আলোর মতো বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্তি; সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কী মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে, এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ-মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কী, আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধহয় স্ত্রীমূর্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতি, এত সৌরভ যে, আমি সেদিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর-এক স্ত্রীমূর্তি। সেও জ্যোতির্ময়ী; কিন্তু চারিদিকে মেঘ, আভা ভালো বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা, কিন্তু অতি রূপবতী মর্মপীড়িতা কোনো স্ত্রীমূর্তি

কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া ঢেউ দিতে দিতে, সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশির শব্দের মতো শব্দ হইল। সে চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এসো। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কীপ্রকারে।' তখন আবার বাঁশির শব্দে শব্দ হইল, 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এসো।' আমি কী বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।' এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। 'ভৃঙ্গরাজ' কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্যপুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুইজনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী ভাবিতেছ?'

মহেন্দ্র। কী করিব, তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব—চলো গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে?'

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোখ ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।'

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'সে কোথা, কী প্রকারে যাইবে?'

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'সে কী? বিষ খাইবে?'

'খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—' কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন। প্রতি পলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করিলেন না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু বলিয়া কী বলিতেছিলে?'

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটিতে রাখিলেন। তখন দুইজনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটি একবার বাঁ-হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তারপর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ

হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তারপর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল, মনে করিল, এও তার একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্য—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।

'কী খাইল! কী খাইল! সর্বনাশ!' কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙুল পুরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর-একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া—সবে গুটিকতক দাঁত উঠিয়াছে—মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয়, বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য লাগিয়াছিল; কেননা, কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একটু কি পেটে গেছে?'

মন্দটাই আগে বাপ-মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালোবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখনো দেখেন নাই যে, বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটি হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'বোধহয় অনেকটা খাইয়াছে।'

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে-যে দুই-এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছটফট করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষে কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, 'আর দেখ কী? যে-পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।'

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, 'কী করিলে—কল্যাণী ও কী করিলে?'

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, 'প্রভু, কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।'

'কল্যাণী, কী করিলে,' বলিয়া মহেন্দ্র চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, 'আমি ভালোই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ, আমি দেববাক্য লজ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও।'

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, 'তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই তো কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কী!'

কল্যাণী। কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ, এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি তো মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালোই করিলাম। আমায় আশীর্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।—এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোনও উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, 'দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম তো অবশ্য আর কেহ মারিত। আমি মরিয়া ভালোই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজন একত্রে অনন্ত স্বর্গভোগ করিব।'

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে-অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে-সময় সেদিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে।

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল; তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে।

তখন কল্যাণী অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'বলো,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

কাননির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুর স্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিলেন,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

তখন চারিদিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

তখন যেন গাছের পাখিরাও বলিতে লাগিল,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষু নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী 'হরে মুরারে' ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিদিগকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব শোভাময়ী—এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহি বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সে-সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেননা, তাহারা ভিক্ষোপজীবী; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা, তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল। এজন্য বুভুক্ষু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি-কলসি ভাঙিয়া উদর অর্ধপূরণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোনো কালে গৈরিকবসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণ কল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদ্দী জমাদার সিপাহি লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণপূর্বক বলিল, 'এই শালা সন্ন্যাসী।' আর একজন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল—কেননা, সে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর-একজন শষ্পোপরি লম্ববান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ওইরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোনও কথাবার্তা না বলিয়া দুইজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা-রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কী হইতেছিল, কী হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোনও আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই-চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল, এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, একটানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া একজন সিপাহিকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিনজন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, 'আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচজন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।' সত্যানন্দ বলিলেন, 'আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কী—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি, যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চলো, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।' তখন তাঁহারা দুইজনে আর কোনও মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

কিছুদূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাপু, আমি হরিনাম করিয়া থাকি—হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?' সত্যানন্দকে ভালোমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, 'তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধহয় তোমার খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাশ ফাঁসি যাইবে।' তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন—

ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর, গমনবিলম্বন
অতি বিধুরা সুকুমারী ॥
ইত্যাদি।

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল রাজসরকারে এতালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার

অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না; কেননা, বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'আজ অতি আনন্দের দিন। কেননা, আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বলো হরে মুরারে!' মহেন্দ্র কাতরস্বরে বলিলেন, 'হরে মুরারে!'

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে এ স্ত্রী-কন্যা তো অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর তো কোনো সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে-শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে-শক্তি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আমার স্ত্রী-কন্যাকে শৃগালে কুক্কুরে খাইতেছে—আমাকে কোনও ব্রতের কথা বলিবেন না।'

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকো। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, 'আপনি কীপ্রকারে জানিলেন? আপনি তো বরাবর আমার সঙ্গে।'

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোনো কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন যে, মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, 'বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।' এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্যন্ত আসিলেন। কী করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী পরীক্ষা?'

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, 'মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?'

মহেন্দ্র বলিল, 'আমার নাম।'

আগন্তুক বলিল, 'তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।'

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন মিথ্যাকথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, 'মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্য আসিয়াছি।'

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কী প্রকারে?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশানো সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ-সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামাজোড়া পাগড়ি বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীর। কেন—সে কী?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফিরিলে যে?'

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাকো। উভয়েই আজ রাত্রে অন্যপ্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কানে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাত দিন খায় নাই। রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল। তাহার জীবনদান জন্য জীবানন্দ দণ্ড-দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন।

ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।

নদীর ধারে আবার কোনো মাগী না-খেয়ে পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে-ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমান কর্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, 'এ সঙ্কেতের সে-অর্থ নয়। তাঁহার জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়—এই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।'

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা। কেননা, প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম। যাহা হউক, মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ-ভালুক খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছুদূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহারও চালে একটি ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেওয়ালে আলিপনা—কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এইজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ি। চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়িতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনর-ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোটমেয়েটি কখনও চরকার শব্দ শুনে নাই। বিশেষত মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতেরো কি আঠারো বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। 'এ কী এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা, তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি?'

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কিল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, 'বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেজিপেঁজি পেলি না কি? ঘরে দুধ আছে?'

তখন সে যুবতী বলিল, 'দুধ আছে বই কী, খাবে?'

জীবানন্দ বলিল, 'হ্যাঁ খাব।'

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর-ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটি সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটি কী ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—বোধহয় এই যুবতীকে ফুল্লকুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধহয় উননের তাপের আঁচ মেয়েটিকে একবার লাগিয়াছিল, তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, 'ও নিমি! ও পোড়ারমুখি! ও হনুমানি! তোর এখনও দুধ জ্বাল হল না?' নিমি বলিল, 'হয়েছে।' এই বলিয়া সে পাথরবাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত করিল।

জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ইচ্ছা করে যে, এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব নাকি?'

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে কে খাবে?'

জীবা। ওই মেয়েটি খাবে দেখছিস্ নে, ওই মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ওই ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা?'

জীবানন্দ বলিলেন, 'তোর কি রে পোড়ারমুখী?'

নিমি বলিল, 'আমায় মেয়েটি দেবে?'

জীবানন্দ বলিল, 'তুই মেয়ে নিয়ে কী করবি?'

নিমি। আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, 'তুই নিয়ে কী করবি? তোর কত ছেলেমেয়ে হবে।'

নিমি। তা হয় তবে, এখন এ মেয়েটি দাও, এরপর নাহয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে, আমি চল্‌লুম এখন—

নিমি। সে কী দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটি খাব? দুই তো পেরে উঠব না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মতো পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের ডাল, জঙ্গুলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, 'নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসেনি?'

নিমি বলিল, 'মন্বন্তর আস্‌বে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই শহরে বেচে এল—আমরা বেচি নাই।'

জীবানন্দ বলিল, 'বোনাই কোথা?'

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, 'সের দুই-তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে।'

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ্ টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে-সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, 'দাদা, আর কিছু খাবে?'

জীবানন্দ বলিল, 'আর কী আছে?'

নিমাইমণি বলিল, 'একটা পাকা কাঁটাল আছে।'

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোনও আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, 'দাদা আর কিছু নাই।'

দাদা বলিলেন, 'তবে যা। আর-একদিন আসিয়া খাইব।'

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, 'দাদা, আমার একটি কথা রাখিবে?'

জীবা। কী?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কী বল্ না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখবে?

জীবা। কী আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কী বল্?

নিমাই তখন এক হাতে আর-এক হাতের আঙুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া, একবার মাটিপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, 'একবার বউকে ডাক্‌ব?'

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, 'আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি একদিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার, তাই আমাকে বলিস্।'

নিমাই বলিল, 'তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী। একবার বউকে ডাক্‌ব?'

'আমি চললুম।' এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায়—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কবাট রুদ্ধ করিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, 'আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বউয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।'

জীবানন্দ বলিল, 'আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্?'

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, 'বড় কীর্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ কর্‌বে, লোক মারবে, আমি তোমায় ভয় করব! তুমিও যে-বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।'

জীবানন্দ হাসিল, 'ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ্, ফের যদি এমন কথা বল্‌বি, তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিব।'

নিমি মনে মনে বলিল, 'আমিও তা হলে বাঁচি।' এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্তী এক পর্ণকুটিরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটিরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, 'বউ শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!' বউ বলিল, 'শিগ্‌গির কি লো! ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?'

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা

চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কিল মারিয়া বলিল, 'তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল্।' সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, 'কি লো, তুই কি খেপেছিস্ নাকি?'

নিমাই দুম করিয়া তাহার পিঠে এক কিল মারিল, বলিল, 'শাড়ি বের কর।'

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়িখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য, কেননা, এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে-বৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য; তৈল নাই—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে-সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্বচনীয় কী ছিল! অনির্বচনীয় মাধুর্য, অনির্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্বচনীয় প্রেম, অনির্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ি বাহির করিয়া দিল। বলিল, 'কি লো নিমি, কী হইবে?' নিমাই বলিল, 'তুই পর্‌বি।' সে বলিল, 'আমি পরিলে কী হইবে?' তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, 'দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে!' সে বলিল, 'আমায় যেতে বলেছেন! তো ঢাকাই শাড়ি কেন? চল্ না এমনি যাই।' নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটিরের বাহির করিল। বলিল, 'চল্, এই ন্যাক্ড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।' কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ির দ্বার পর্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোনো গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপজলের কার্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্বা ভাঙিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবানো আগুনে ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে তো দেখিতে পাইল না। তারপর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে, তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চক্ষে যে-স্রোত আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, 'ছি কাঁদিও না; আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যে-প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।'

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? তোমার তো খাইবার পরিবার অভাব নাই।'

শান্তি বলিল, 'তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কী করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—'

জীবা। গ্রহণ করিব—শান্তি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালোবাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন, 'কেন দেখা করিলাম!'

শান্তি। কেন করিলে—তোমার তো ব্রতভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া তো আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এইজন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। একদিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার; একদিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই একদিকে আর-একদিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না যে, কোন্‌দিকে ভারী হয়। দেশ তো শান্তি, দেশ লইয়া আমি কী করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কী? দেশের লোকের দুঃখ—যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থি বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে? আমার সকল ধর্মের সহায় তুমি। সে সহায় যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতন ধর্ম কী? আমি কোন্ ধর্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চলো গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছুকাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল, 'ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালোবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তোমার বীরধর্ম কখনও ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কী?'

জীবানন্দ বলিলেন, 'প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—২২ কাহন কড়ি।'

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'প্রায়শ্চিত্ত কী, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই?'

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সকল কথা কেন?'

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, 'সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না-দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, একদিন অবশ্য সে-দেখা দেখিব। একদিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন

চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।'

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এখন কোথায় যাইবে?'

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যেভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরি-গুণগান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্নমুখে জ্ঞানানন্দনামা একজন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, 'গোঁসাই, মুখ অত ভারী কেন?'

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, 'কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্য নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কী জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।

ভবানন্দ বলিলেন, 'তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।'

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্নসকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রুশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশেক দূরে দুইটি অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃত স্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতি রোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে-সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে-সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে বন্দিভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটিও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোনো স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে কর লগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন।

মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কী করিব। এইরূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দন্ত ভেদ করিয়া অঙুলি দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃপুন এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল, যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়িতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন নাড়ির গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায়, কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র, দুইজনে বন্দি হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারিহস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতনধর্মের পুনঃপ্রচার জন্য শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়—তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দি। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?' হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন, 'এই বাহুতে কি বল নাই?' বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাকো : হরে মুরারে মধুকৈটভারে।—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা—আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয়

হইবে। চলো, আমরা সেই যবনপুরী ভাঙিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙিয়া খড়কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বলো—হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।' সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক-সহিত ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢাল যোদ্ধৃবর্গের কর্কশপৃষ্ঠে তড়বড় শব্দ করিতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশুসকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষিসকল ভয়ে উচ্চ রব করিয়া গগনে উঠিয়া আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুল রবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া, কারাগার ভাঙিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল। এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই, তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, 'ফিরিয়া চলো, অনর্থক অনিষ্ট সাধনে প্রয়োজন নাই।'

সন্তানদিগের এইসকল দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া দেশের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থ একদল 'পরগণা সিপাহি' পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমত নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি-সড়কি বা বিশ-পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কী করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে-সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি ছাত্র বাস করিত; শান্তি অন্যসময়ে তাহাদিগের কাছে বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত; তাহারাও শান্তিকে আদর করিত।

এইরূপ শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মতো কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মতো কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখনো মেয়ে-কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত। টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শান্তিও কখনো খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরুনি দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলা কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে ও গালের উপর দুলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত, শান্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত। যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না। ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্তমানে, অশ্লীল সংস্কৃতের দুই-চারিটা বুকনি দিয়া, দুই-একটা আদিরসাশ্রিত গল্প করিতেন, টিয়াপাখির মতো শান্তি সেগুলিও শিখিল—টিয়াপাখির মতো, তাহার অর্থ কী, তাহা কিছুই জানিত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিতে লাগিল। দেখিয়া, শুনিয়া শান্তির পিতা 'যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি' বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই-একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। তারপর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গেল; কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভালোবাসিত—শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

তখন জীবানন্দের পিতা-মাতা বর্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন এ পরের মেয়ের

দায়ভার নেয় কে?' জীবানন্দ বলিলেন, 'আমি আনিয়াছি—আমিই দায়ভার গ্রহণ করিব।' পিতা-মাতা বলিলেন, 'ভালোই।' জীবানন্দ অনূঢ়—শান্তির বিবাহবয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, 'কাজটা ভালো হয় নাই।' শান্তি কিছুতেই মেয়ের মতো কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ির নিকটেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর-শাশুড়ি প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। একদিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা-সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে একদল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মতো ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ, এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর একপ্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালকসন্ন্যাসীবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায়মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রাখর্য, চতুরতা, এবং কর্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ-বিদেশ পর্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল।

ক্রমশ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোনো কথা কহিল না।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শান্তি সংস্কৃতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়াছি, কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা তিনি শান্তির অভিনব যৌবনবিকাশজনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পুনর্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যাকে আদিরসাশ্রিত কাব্যসকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শান্তি তাহা শিখে নাই; তখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল। পৌরুষ চরিত্রের উপর নির্মল স্ত্রীচরিত্রের অপূর্ব প্রভা আসিয়া পড়িয়া, শান্তির গুণগ্রাম উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শান্তি পড়া ছাড়িয়া দিল।

ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও

দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কিল-ঘুসার দ্বারা পূজিত করিত—কিল-ঘুসাগুলি সহজ নহে। একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শান্তির হাতখানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতখানা শান্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শান্তি তাহার কপালে এমন জোরে ঘুসা মারিল যে, সন্ন্যাসী মূর্ছিত হইয়া পড়িল। শান্তি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্যফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ি তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ি ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এতদিন কোথায় ছিলে?' শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য-মিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অপ্সরাগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্মিত যে-সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গ্যাস জ্বালে, বাঙ্গালি তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব, সূর্যদেবের পরেও কখনও কখনও আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন; যে-সিন্দুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্দুকেই টাকা লইয়া যান, যম যার প্রায় সবগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তারই বাকিটিকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নির্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধহয় পুষ্পধন্বার কোনো কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

জীবানন্দ বলিল, 'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাকো।'

শান্তি বলিল, 'তুমি ফিরিয়া আসিবে তো?' জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোনো দিক না চাহিয়া, সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটির নির্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীর রমণীচরিত্রের নিত্যনবোন্মেষ হইতে

লাগিল। সুখস্বপ্নের মতো তাঁহাদের জীবন নির্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম গ্রহণপূর্বক শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল। তাহাই আমি পূর্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল, 'তবু তো দেখা হল।'

শান্তি কিছুই উত্তর করিল না। চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভালোবাসে না, তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল—বলিল, 'দেখ দেখি বউ কেমন মেয়েটি।'

শান্তি বলিল, 'মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হল কবে লো।'

নিমা। মরণ আর কী—তুমি যমের বাড়ি যাও—এ যে দাদার মেয়ে!

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ-কথাটা বলে নাই। 'দাদার মেয়ে' অর্থাৎ দাদার কাছে যে-মেয়েটি পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল, 'আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।'

নিমাই উচিত-শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'কার মেয়ে কী জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে-মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার তো অবসর হল না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলেপিলে পথেঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে-ছেলে কি আবার নেয়?' (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

'মেয়েটি দিব্য সুন্দর, নাদুস্ নুদুস্ চাঁদপনা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।'

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ি ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটিরে গেল। কুটিরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনাআপনি বলিল, 'এতদিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। যে আশায় এতদিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল! যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই।'

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ির উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে,

শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি ব্যাপৃত হইল। মাথার রুক্ষ আগুলফলম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ববিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তার পর সেই গৈরিক বসনখানি অর্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু-অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। ঘরে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল, 'হায়! কী করিয়া কী করি।' তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়া ছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রুগুম্ফ রচিত করিল। কিন্তু পরিতে পারিল না। ভাবিল, 'ছি! ছি! ছি! তাও কি হয়! সে দিনকাল কি আছে! তবে বুড়ো বেটাকে জব্দ করিবার জন্য, এ তুলিয়া রাখা ভালো।' এই ভাবিয়া শান্তি সেগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম বাহির করিয়া, কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া, কণ্ঠ হইতে জানু পর্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত*

'দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।'
'সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।'

২

'পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।'
'ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিনজন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কী দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম?'

---

* রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া।

সত্যানন্দ বলিলেন, 'দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয় আছে। সেদিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি এতদিন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী পুনর্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যে-মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে-ব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোনো কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা-যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠিসোঁটা বল্লমে কী হইবে? অতএব আমাদিগের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ওইরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।'

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কী প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যতদিন না ফিরিয়া আসি, ততদিন তোমরা কোনো গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার রণজয়ের জন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুইজনের উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিলেন, 'তীর্থযাত্রা করিয়া এ-সকল সংগ্রহ করিবেন কী প্রকারে? গোলা গুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?'

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম নির্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কী! এই আনন্দমঠে?

সত্য। তাও কি হয়? ইহার উপায় আমি বহুদিন চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান্ প্রতিকূল। আমি দেখিতেছি, তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে?

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কী! সেখানে কীপ্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কীজন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কী আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী-কন্যার কী অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল। সে তো মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে-স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সে-ই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোনো কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, 'মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে?'

সত্য। বিষ পান করিয়া।

জীব। কেন বিষ খাইল?

সত্য। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভব। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্নকাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্ধা রাখে কি?

সত্য। হ্যাঁ, আর-একটি নূতন লোক। পূর্বে আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবাপুরুষ। আমি তাঁহার আকারেঙ্গিতে ও কথাবার্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটি সোনা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। কেননা, জীবানন্দ লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটি উপদেশ বাকি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগপূর্বক তাহা শ্রবণ কর।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিলেন, 'আজ্ঞা করুন।'

সত্যানন্দ বলিলেন, 'তোমরা দুইজনে যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকো, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যকর্তব্য হইবে।'

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, 'তোমার উপর নাকি?'

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়িতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভব। তাতে দোষ কী, সেটা তো নিষিদ্ধ নহে, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি?

জীব। বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, 'তোমার কন্যা জীবিত আছে।'

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন?

মহে। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ?

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যতদিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, ততদিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কী করিবে? দেখিতে তো পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ- কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মতো সে কখনও মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভালো বুঝিতে পরিলাম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোনও গুরুতর কার্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্মের নিয়ম এই যে, যেদিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না-দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রেই কি এইরূপ পুত্র-কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প!

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি সড়কিওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোনো গুরুতর কার্যের অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কী? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি তো ইতিপূর্বেই মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কী প্রকারে?

সত্য। আমি সে-পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে-অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক

প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ-যে কেমন নূতন-নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ওইরকম কথাসকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যিশুকে প্রেম কর। এ-যে সেইরকম কথা।

সত্য। যে-রকম কথা আমাদিগের চতুর্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেইরকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হ্যাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভালো। এই তিনটি গুণের পৃথক পৃথক উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান্ শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায় মাত্র?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল—মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ কথাবার্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজ মূর্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প, স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর-একজন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু 'হরে মুরারে' শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি দীক্ষিত হইবে?'

সে বলিল, 'আমাকে দয়া করুন।'

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, 'তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ তো?'

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তানধর্মের নিয়মসকল পালন করিবে?
উভয়ে। করিব।
সত্য। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে?
উভ। করিব।
সত্য। মাতাপিতা ত্যাগ করিবে?
উভ। করিব।
সত্য। ভ্রাতা, ভগিনী?
উভ। ত্যাগ করিব।
সত্য। দারাসুত?
উভ। ত্যাগ করিব।
সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাসদাসী?
উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।
সত্য। ধন—সম্পদ্—ভোগ?
উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।
সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনও একাসনে বসিবে না?
উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।
সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না? যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?
উভ। দিব।
সত্য। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?
উভ। করিব।
সত্য। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না?
উভ। না।
সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?
উভ। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।
সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কী জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জাতি। অপরটি কী জাতি?
অপর ব্যক্তি বলিল, 'আমি ব্রাহ্মণকুমার।'
সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কী বলো?
উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।
সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে-সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্বান্তর্যামী, সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।
উভ। তথাস্তু।
সত্য। তোমরা গাও 'বন্দে মাতরম্।'
উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, 'দেখ বৎস! তুমি-যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মার সুমহৎ কার্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম পালন করিতে হইবে।'

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, 'এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশদিন নির্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটির বাঁধ, এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহনির্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুকসকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেইসকল অর্থের দ্বারা এইসকল কার্য নির্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্মা শিল্পিসকল আনাইতেছি। শিল্পিসকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এইজন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।'

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র, সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেইদিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, 'কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?'

শিষ্য বলিল, 'কী প্রকারে বলিব? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয়তো সে ভণ্ডামি, নয়তো আত্মপ্রতারণা।'

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভালো বিবেচনা করিয়াছ। যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সে অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেননা, তুমি বয়সে অতি নবীন। বৎস, তোমায় কী বলিয়া ডাকিব, তাহা এ-পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।'

নূতন সন্তান বলিল, 'আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।'

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্বে কী নাম ছিল? যদি বলিতে কোনও বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না। সন্তানধর্মের মর্ম এই যে, যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোনও ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কালো কুচকুচে দেড়হাত লম্বা দাড়ি বামহাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন, 'ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে তো এ-বয়সে দেড়হাত দাড়ি কেন? আর, দাড়ি খাটো করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চোখের চাহনি কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্বোধই হইতাম, তবে কি এতবড় কাজে হাত দিতাম?'

শান্তি পোড়ারমুখী তখন দুইচোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'প্রভু দোষই-বা কী করিয়াছি। স্ত্রী-বাহুতে কি কখনও বল থাকে না?'

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখনও পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, 'এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাঁকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।'

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?'

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারিজন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি। আর?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, 'এ কী! তুমি দেবী, না মানবী?'

শান্তি করজোড়ে বলিল, 'আমি সামান্য মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।'

সত্য। তাই-বা কিসে? তুমি কি বালবিধবা? না, বালবিধবারও এত বল হয় না; কেননা, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, 'মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?'

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলা হাতির শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, 'কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?'

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল, 'পাপাচরণ কী প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম অধর্ম। আমি তাঁহার সহধর্মিণী, তিনি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।'

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, 'তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা, পত্নী কেবল গৃহধর্মেই সহধর্মিণী—বীরধর্মে রমণী কী?'

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন? অর্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা করুন দেখি। ভীমের যত বল, ততগুলি পত্নী। কত বলিব? আপনাকে বলিতেই-বা কেন হইবে?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?

শান্তি। অর্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্যে বিরত করে। এইজন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণীজাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণহস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণহস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামিসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভালো, তোমায় দিনকত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিলেন, 'আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?'

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে?

শান্তি। তার পর?

সত্য। মা ভবানীর মতো তোমারও ললাটে আগুন আছে, সন্তানসম্প্রদায় কেন দাহ করিবে? এই বলিয়া, পরে আশীর্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল, 'র বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুন! আমি পোড়াকপালি, না তোর মা পোড়াকপালি?'

বস্তুত সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বুড়ো বয়সে ছেলেমানুষকে বলা যায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্ধন নামে একজন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনওটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল।

শান্তি বলিল, 'ভাই সন্তান, এইদিকে যে-কয়টা ঘর রহিল, এ তো দেখা হইল না?'

গোবর্ধন বলিল, 'ওসব খুব ভালো ঘর বটে, কিন্তু ও-সকলে লোক আছে।'

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চলো না।

গোবর্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কীপ্রকারে সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন উর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকরাশি আকর্ণপ্রসারি ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কালো ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা কী শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না। কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা কার ঘর?'

গোবর্ধন বলিল, 'জীবানন্দ ঠাকুরের।'

শান্তি। সে আবার কে? কই, কেউ তো এখানে নেই।

গোব। কোথাও গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটি সকলের ভালো।

গোব। তা এ ঘরটা তো হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি নাহয় আর-একটা ঘর খুঁজে নিন।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ-ঘরে আছেন, তিনি কর্তা বললেই হয়, যা করেন তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্বক, প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুঁথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র জীবানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, 'এ কী এ? শান্তি?'

শান্তি ধীরে ধীরে পুঁথিখানি রাখিয়া, জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল, 'শান্তি কে মহাশয়?'

জীবানন্দ অবাক—শেষে বলিলেন, 'শান্তি কে মহাশয়? কেন, তুমি শান্তি নও?'

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, 'আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।' এই কথা বলিয়া সে আবার পুঁথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চহাস্য করিলেন, বলিলেন, 'এ নূতন রঙ্গ বটে। তার পর নবীনানন্দ, এখানে কী মনে করে এসেছ?'

শান্তি বলিল, 'ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয়। আমিও আপনাকে অসম্মান করিয়া কথা কহিতেছি না—তবে আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করিতেছেন?'

'যে আজ্ঞে' বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, 'এক্ষণে বিনীতভাবে ভৃত্যের নিবেদন, কীজন্য ভরুইপুর হইতে, এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।'

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, 'ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখিতেছি না। ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া, আজ দীক্ষিত হইয়াছি।'

জী। আ সর্বনাশ! সত্য নাকি?

শা। সর্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত।

জী। তুমি যে স্ত্রীলোক!

শা। সে কী! এমন কথা কোথা পাইলেন?

জী। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয়।

শা। ব্রাহ্মণী? আছে নাকি?

জী। ছিল তো জানি।

শা। আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ আবার জোড়হাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশয়!'

শা। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার কর্তব্য কী বলুন দেখি?

জী। আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান।

শা। এ আপনার দুষ্টবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জু ভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে, পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে—কত কোটী তা কে জানে—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্‌ণ হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ি পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে-সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে-সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে-স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্যহস্তিসকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমিদারের খাজনা দিতে পারে না; জমিদারেরা রাজার খাজনা দিতে পরে না। রাজা জমিদারি কাড়িয়া লওয়ায় জমিদারসম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধান জন্মে না। কাহারও ঘরে ধান নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এদিকে সন্তানসম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ভাই! যদি একদিকে এক ঘর মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ, আর-একদিকে একটা ভাঙা বন্দুক দেখ, মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।'

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই বিষ্ণুপূজা করবি? এই বলিয়া ২০/২৫ জন জড়ো করিয়া,

মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে।

লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমানরাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখনও কখনও প্রাণবধ করে, যেখানে সরকারি টাকা পায়, লুঠিয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ, শস্ত্রযুক্ত এবং মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোনও সন্তানের দলকে যবনসৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর-একদল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া 'হরি হরি' বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। এই সময়ে প্রথিতনামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ সাহেব ভারতবর্ষের গভর্নর জেনরেল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন, তথাস্তু। কিন্তু সেদিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ প্রথমে ফৌজদারি সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারি সিপাহির এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোনো বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমিদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া, কোম্পানির সুশিক্ষিত সশস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী-বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া, সে-সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেইসকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন: বলিয়া দিলেন, তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মতো জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মতো তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানির সৈনিকেরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গিন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মতো কর্তিত হইতে লাগিল। 'হরি হরি' ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ওইরূপ এক কুঠি ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেইজন্য কোনওপ্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই-চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলা চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ি গাড়ি বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগি, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগ্‌দীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ি আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহিদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই-চারিটা গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহি লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে, আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দি হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস, দ্বিতীয় ব্লেনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্তত বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কী, এক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রী-পুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, 'তা হইবে, আপনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর-একটু স্থির হউক, স্ত্রী-পুত্র লইয়া আসিব।' ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মাটন মুরগি ছিল। পনিরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্যপক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান্ বাবুর্চীটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভবানন্দ মনে মনে গরগর করিতেছে; ভাবিতেছে, কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটি কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ-যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধনের জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কী প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ-কথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন, এ অসুরের বংশ একদিনে নিপাত করিব; সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া দ্রৌপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালোবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। একদিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারি লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কী, টমাস সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্যে ইংরেজ-জাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহু দূর আসিয়া শিকারিরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবও সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে,

তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন, 'তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।' এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুত অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্তত ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কী দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত ফুল্লকুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, 'টুমি কে?'

সন্ন্যাসী বলিল, 'আমি সন্ন্যাসী।'

কাপ্তেন বলিলেন, 'টুমি rebel ।'

সন্ন্যাসী। সে কী?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলি করিয়া মারিব।

সন্ন্যাসী। মারো।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণচর্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। এক টানে জটা খুলিয়া ফেলিল; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু-মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।'

সাহেব। টুমি কে?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। যাঁহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। টুমি হামারা গোড়ে* ঠাকিব?

শান্তি। কী? তোমার উপপত্নীস্বরূপ?

সাহেব। ইষ্ট্রির মট ঠাকিটে পাড়, লেগেন সাদি হইব না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে; আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেব, তুমি সেই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্তমান কলা হয়।

সাহেব। টুমি বড় spirited woman আছে, টোমার courage-এ আমি খুসি আছে। টুমি আমার গোড়ে চলো। টোমাড় স্বামী যুডেড মরিয়া যাইব। টখন টোমার কী হইব?

শান্তি। তবে তোমার আমার একটা কথা থাক। যুদ্ধ তো দুদিন চারিদিনে হইবেই। যদি তুমি জেতো, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিতি, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে তো?

সাহেব। কলা খাইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে?

---

* ঘরে।

শান্তি। নে, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!
শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিক্বণে বাজিল তাই—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তাহার সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতাসকল কাঁপাইয়া তুলিল। শান্তি গাইতে গাইতে চলিল—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
জলেতে তুফান হয়েছে
আমার নূতন তরী ভাস্‌ল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

সারঙ্গেও ওই বাজিতেছিল—

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কী আছে, বাহির হইতে একবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখানে সেই শাখাপল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটির আছে। ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাটের মেজে, তার উপর মাটির ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতদিনের পর জোয়ার গাঙে জল ছুটেছে কি?'

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, 'নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে?'

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'দেখ শান্তি! একদিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ তো উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এতদিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন—'

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, 'আমি তোমার ধর্মপত্নী, সহধর্মিণী, ধর্মে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুইজন একত্র সেই ধর্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্মবৃদ্ধি করিব। ধর্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কী পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কই, কোনওদিন তো একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?'

জীবানন্দ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, 'শিখাইলে তো?'

শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, 'আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালোবাস, আমি তোমায় ভালোবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কী গুরুতর ফল আছে? বলো 'বন্দে মাতরম্'।'

তখন দুইজনে গলা মিলাইয়া 'বন্দে মাতরম্' গায়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুইপার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী; সূর্যদেব মধ্যাহ্নে এক-একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশের একটি দোতলা বাড়িতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটি ঘরে যেখানে অর্ধবয়স্ক একটি স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেইখানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটি অর্ধবয়স্কা, মোটাসোটা, কালো কালো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমান্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্‌ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্‌ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্‌গল্ করিয়া মাগী আপনাআপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গিতে তাহার মাথার চূড়ার নানাপ্রকার টলুনি-টালুনির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ঠাক্‌রুন দিদি, প্রাতঃপ্রণাম!'

ঠাক্‌রুন দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না; কেননা, সক্‌ড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল—হায়! তাহাতে পূজার সময় একটি বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঢাকিতে সক্ষম

হইল না; কেননা, ঠাক্‌রুনটি একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আব্‌রু পর্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কানের উপর উঠিয়া বলিল, আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরমব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরানী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কানের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'কে, গোঁসাই ঠাকুর? এসো এসো! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?'

ভব। তুমি ঠান্‌দিদি যে!

গৌরী। আদর করে বলো বলিয়া। তোমরা হলে গোঁসাই মানুষ, দেবতা! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাকো। তা করিলেও করিতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষা গৌরীদেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, 'সে কী ঠান্‌দিদি! রসের মানুষ দেখে ঠান্‌দিদি বলি। নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে, মনে নাই? আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকম আছে জানো, আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করে ফেলি। সেই কথাটাই বলতে এসেছি।'

গৌরী। সে কী কথা, ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! আমরা হলেম বিধবা।

ভব। তবে সাঙ্গা হবে না?

গৌরী। তা ভাই, যা জানো তা করো। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়েমানুষ, কী বুঝি? তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতিকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে?'

গৌরী বিষণ্ন হইল। মনে মনে সন্দেহ করিল, সাঙ্গার কথাটা তবে বুঝি তামাশা। বলিল, 'আছে আর কেমন, যেমন থাকে।'

ভবা। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি একবার সাক্ষাৎ করিব।

গৌরীদেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া, বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙিয়া, দোতলার উপর উঠিতে লাগিল। একটি ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকাশ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণী-তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্বের মতো চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্বের মতো সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্বমতো অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু, পূর্বের মতো বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় ঢল ঢল, বাহু তেমনি বনলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কী, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে-সৌন্দর্য আর সে-মাধুর্য। নূতন

হইয়াছে ধৈর্য গাম্ভীর্য। ইঁহাকে পূর্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইঁহার চারিপার্শ্বে দুই-তিনখানা তুলটের পুথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙানো আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নরনারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্রগুলির নিচে লেখা আছে, 'চিত্র না বিচিত্র?' সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন কল্যাণী, শারীরিক মঙ্গল তো?'

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কী ইষ্ট, আর আমারই-বা কী ইষ্ট?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ। তোমার মৃতদেহে আমি জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে?

ভব। জীবন কি বিষ?

ক। না হলে অমৃত ঢালিয়া আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন?

ভব। সে অনেকদিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, 'আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময়।'

ভব। সত্য কল্যাণী, আমার জীবন বিষময়। যেদিন অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

ক। না।

ভব। অভিধান?

ক। ভালো লাগে না।

ভব। বিদ্যা অর্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। এখন এ অশ্রদ্ধা কেন?

ক। আপনার মতো পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখাপড়া না-করাই ভালো। আমার স্বামীর সংবাদ কী প্রভু?

ভব। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি তো তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই তো তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণী?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায়? তিনি কেমন আছেন?

ভব। ভালো আছেন।

ক। কোথায় আছেন? পদচিহ্নে?

ভব। সেইখানেই আছে।

ক। কী কাজ করিতেছেন?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্মাণ, অস্ত্রনির্মাণ। তাঁহারই নির্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগকে মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসি বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভব। স্ত্রী সহধর্মিণী, ধর্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্মে। বড় বড় ধর্মে কণ্টক। আমি বিষকণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্মকণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে কেন?

ভব। ভালো, যা দিয়াছি, তা নাহয় আমারই আছে। কল্যাণী! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেকদিন সেদিকে যান নাই।

ক। সে সংবাদ কি আমায় জানাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম তো কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ-জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন এত করিবেন?

ভব। করিব কল্যাণী। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কী ঠাকুর?

ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁরই হইব। আমি-যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না?

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কিছু বলেন না?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কী?

ক। কী বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তানধর্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতল জলে।

ক। এই মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য এসব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ; সন্তানধর্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যেদিন তোমার প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখনও চক্ষে দেখিব জানিলে, কখনও সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণী দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ-কথা কি সত্য?

ভব। এ-কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেননা, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল, 'দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?'

কল্যাণী বলিল, 'রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া মনে রাখিব।'

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে হে যাও?'

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, 'জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক।'

ভব। বন্দে।

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, 'মাতরম্।'

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

অগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে?

ধীর। আপনারই সন্ধানে।

ভব। কেন?

ধীর। একটা কথা বলিতে।

ভব। কী কথা?
ধীর। নির্জনে বক্তব্য।
ভব। এইখানেই বলো না, এ অতি নির্জন স্থান।
ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন?
ভব। হ্যাঁ।
ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে?
ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে নাকি?
ধীর। সেখানে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী বাস করে?
ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন, বলিলেন, 'এ সকল কী কথা?'
ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?
ভব। তার পর?
ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।
ভব। (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে? দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয়জন এ-কথা জানে?
ধীর। আর কেহ না।
ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি?
ধীর। পার।
ভব। আইস, তবে এই বিজন স্থানে দুইজনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্বাণ কর। অস্ত্র আছে?
ধীর। আছে—শুধুহাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ-সকল কথা কয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম, তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভালো হয় না?
ভব। ক্ষতি কী—বলো না।
ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।
ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—
ভব। কল্যাণী, তাও জানো?
ধীর। বিবাহ কর না কেন?
ভব। তাহার যে স্বামী আছে।
ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।
ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।
ধীর। সন্তান-ধর্ম কি অপরিহার্য—তোমার যে প্রাণ যায়। ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল! (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল।)
ভব। তুমি কী অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোনো স্বার্থ আছে।
ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবারি বসাইও না—বলিতেছি। এই সন্তানধর্মে আমার হাড় জরজর হইয়াছে, আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ

দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তানধর্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমার কি বাড়ি গিয়া বসিবার জো আছে? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে। ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এইজন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন, আমায় কেন?

ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তানসেনা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধে জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা তো তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রী-পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্বাদ করি। সন্তানধর্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। বলিলেন, 'ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।' ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে-না-হইতেই উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। ভবানন্দ তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন না। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্মকণ্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা দুর্ভেদ্য, বন্যপশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোনো বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন-শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকার ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, বিশ্বাস নাই , ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, 'যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথীজলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মতো ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এই মুহূর্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে—দেহের

ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্মত্যাগী? ছি! মরিব!' এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'ও কী শব্দ? কানে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না—কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মরিতে বলিল! পুণ্যময়ী অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের তো মর্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে নিরত কর। ধর্মে—হে গুরুদেব! ধর্মে যেন আমার মতি থাকে!'

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল, 'ধর্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্বাদ করিলাম।'

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। 'এ কী এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ। মহারাজ, কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।'

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃপুন ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃসূর্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিবাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল—'হরে মুরারে! হরে মুরারে!' চিনিলেন—সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ কুটির হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

গোস্বামিবিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবীকণ্ঠনিঃসৃত হইয়া, রাগ-তাল-লয়-সম্পূর্ণ হইয়া, সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসন্তানিলতাড়িত তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।

তখন বাহির হইতে কে অতিগম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর মেঘগর্জনবৎ তানে গায়িল—

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল; বলিল, 'প্রভো, আমি এমন কী ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন, আমাকে কী করিতে হইবে।' বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গাইল—

তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।

সত্যানন্দ বলিলেন, 'মা, তোমার কুশলই হইবে।'

শান্তি। কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য!

সত্য। তোমারে আমি চিনিতাম না। মা! দড়ির জোর না-বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্যোদ্ধার হইতে পারে।

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদম্বিনীবিরাজিত বিদ্যুত্তুল্য ঘোর রোষকটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল, 'কি ঠাকুর! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব। মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কী? আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মরিব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি, আমার স্বর্গ নাই?'

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, 'আমি কখনো হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা, আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্যোদ্ধার হইবে।'

বিজলি হাসিল। শান্তি বলিল, 'আমার স্বামীর ধর্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম বড়। আমার ধর্মে আমার যেদিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয়, মরিবেন, আমি বারণ করিব না।'

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরিবে, বোধহয়, মা, তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্যে কি মরা ভালো?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেননা, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।'

এই বলিয়া সত্যানন্দ 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কী কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

জোছনারাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশসহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া মহাকোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কীজন্য কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কানাকানি করিতে লাগিল, 'মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।' তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চিৎকার করিতে লাগিল, 'মার, মার, নেড়ে মার।' কেহ বলিল, 'জয় জয়! মহারাজ কি জয়।' কেহ গায়িল, 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে!' কেহ গায়িল, 'বন্দে মাতরম্!' কেহ বলে—'ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?' কেহ বলে, 'ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?' কেহ বলে, 'ভাই এমন দিন কি হইবে, আপনার ধন আপনি খাইব?' দশ সহস্র নরকণ্ঠের কলকল রব, মধুর বায়ুসন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তরতর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্বজনমনোরম 'বন্দে মাতরম্!' সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশসহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয় বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দন, লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর।' তখন সেই সহস্রকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল—

জয় জগদীশ হরে!
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'হে সন্তানগণ, তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা একজন বিধর্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কী বলো?'

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। 'এখনই মারিব—কোথায় তারা, দেখাইয়া দিবে চলো!' 'মার! মার! শত্রু মার!' ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, 'সেজন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টি কামান আসিতেছে—

কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ওই দেখ, প্রভাত হইতেছে—বেলা চারি দণ্ড হইলেই—ও কী ও—'

'গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!' অকস্মাৎ চারিদিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তানসম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

'গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্।' ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, 'গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।' নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল, 'গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!' নদীপারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল, 'গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!' সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, 'তোমরা দেখ, কিসের তোপ।' কয়েকজন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, 'উচ্চবৃক্ষে উঠ, দেখ কী।' তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোপ ইংরেজের।' সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অশ্বারোহী, না পদাতি?'

জীব। দুই আছে।

সত্যা। কত?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্যা। গোরা আছে? না কেবল সিপাহি?

জীব। গোরা আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, 'তুমি গাছ হইতে নামো।'

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, 'দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কী করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।' জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কী বলিলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কী উত্তর করিল, তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তারা দুইজনেই মনে মনে বুঝিল যে, হয়তো এ-জন্মের মতো এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, 'ভাই! এই সময় গাও 'জয় জগদীশ হরে'!' তখন সেই দশসহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল—

জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তানসম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক ছিন্নবাহু ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল, 'জয় জগদীশ হরে!' গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদীসৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল; কেবল সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও পদধ্বনি।

তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতামধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর?'

উপর হইতে একজন বলিল, 'এই কাননের অতি নিকটে, একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র!'

সত্যানন্দ বলিল, 'কে তুমি?'

উপর হইতে উত্তর হইল, 'আমি নবীনানন্দ।'

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, 'তোমরা দশসহস্র সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।' তখন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, 'আইস।'

সেই দশসহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল, 'জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কী?'

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিলেন, 'কী করিতে বলো।'

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য একদণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীব। তুমি সত্যকথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তা হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভব। আজ আমার মরিবার দিন।

জীব। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাকো, আমি যাই।

জীব। ভবানন্দ! তোমার কী পাপ, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, 'মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে, সেই দিন মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কী?'

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্তী হইলেন। তখন দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তানসৈন্য খণ্ডবিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহি সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, 'এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এই সময় গাও 'বন্দে মাতরম্'!' তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তানসেনা তোপের তালে গায়িল, 'বন্দে মাতরম্।'

দশম পরিচ্ছেদ

সেই দশসহস্র সন্তান 'বন্দে মাতরম্' গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ডবিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় একদল সিপাহি বন্দুকে সঙ্গিন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণপার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, 'ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণবধ্বংসের প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।'

ভব। এখন ফিরিবে কী প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বামপার্শ্বে কেহ নাই, চলো, অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বামদিক দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী—নূতন বর্ষায় নদী-যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা নদীর জলে ডুবাইবে?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে, আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশসহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে যে, বোধহয়, একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদয় সন্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কর্ম করো, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখো, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা করো। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল, তাহা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্বার 'বন্দে মাতরম্' শব্দ উত্থিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন, সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? ধানকাটার মতো তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বাম ভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের একজন সহযোগী লেপ্টেনান্ট ওয়াট্‌সন্ দূর

হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি একদল ফৌজদারি সিপাহি, একদল পরগণা সিপাহি লইয়া জীবানন্দের অনুবর্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন যে, 'আমি দুই-চারিশত সিপাহি লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বামদিক্ দিয়া লেপ্টেনান্ট ওয়াট্সন্ যাইতেছেন, দক্ষিণদিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখির মতো মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুরপথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বলো, তাহা হইলে কর্ম সিদ্ধ হইবে।' কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

'অতিদর্পে হতা লঙ্কা।' কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুইশত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া, আর সকল হে-র সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, 'এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা 'জয় জগদীশ হরে' বলো।' তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা 'জয় জগদীশ হরে' বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহি ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, 'কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস—তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাতত তুমি বন্দি। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।' কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গিন সহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মতো ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিল না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, 'ইহাকে বাঁধো।' দুই-তিনজন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিলেন, 'ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও; চলো, উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।'

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া 'বন্দে মাতরম্' গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনান্ট ওয়াট্সন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াট্সন্ তাহাদিগকে দুইদিক হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্নভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোনও আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময় উচ্চৈঃশব্দ হইল, 'পুলে যাও, পুলে যাও! ও পারে যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।'

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, 'জীবানন্দ, পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।' তখন ধীরে ধীরে পিছে হঠিতে হঠিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল। পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, 'জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এসো—তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিনজন এই তোপটা দখল করি।' তখন তিনজনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্তী গোলন্দাজ-সেনা বধ করিলেন। তখন আর-আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, 'বলো বন্দে মাতরম্।' সকলে গায়িল, 'বন্দে মাতরম্।' ভবানন্দ বলিলেন, 'জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।' সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন 'হরি হরি' শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহি তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'তোমরা দুইজনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা এই ব্যূহমুখ রক্ষা করিব—তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জন-কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।' কুড়িজন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়িজন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!—ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুড়িজন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—'গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।' উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের

দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানি, পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই-চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, 'ভাই, নেড়ে ভাঙিতেছে, চলো একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।' তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল-পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথীতরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্বতাকার মত্ত হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল, পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারি, বাদশাহি, ইংরেজি, দেশী, বিলাতি, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্মীর দল পলাইল। 'মার মার' শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ সিপাহি নিহত হইল। সর্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াট্‌সন্ ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, 'আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দি হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।' জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, 'তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।' তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, 'মার মার।'

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২০/৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, 'ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয়জন ব্যতীত আর জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চলো আমরা ফিরিয়া যাই।' ভবানন্দ বলিলেন, 'একজন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ, তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয়জন ইংরেজকে নিহত করি।'

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, 'উহাকে আমার সম্মুখে রাখো, আগে ওই বেটা মরিবে, তবে তো আমি মরিব।'

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল, 'ইংরেজ! আমি তো মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলন্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রিস্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মারো, তার পর এই বিদ্রোহীদিগকে মারো।'

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, একজন আইরিস্‌ম্যান কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে, এ সময় আমাকে রক্ষা করিবে? দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি; আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কেহ আছে?'

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ১০। ১৫।২০। ৫০ জন সন্তান আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, 'তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে।'

ধীর। 'কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল না কি?' এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ একজন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে তো স্ত্রী-পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না!

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখনও বুঝ নাই? (ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন)

ভব। না—(এই সময়ে একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কী যে, তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে-সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কী! মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস? (ভবানন্দ তখন একহাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন)।

ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করতে করিতে বলিলেন, 'কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে-সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।'

ভব। কী প্রকারে?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও। (ভবানন্দ একজন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন, এমত সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও! বলিও, আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, 'তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রের আশীর্বাদবাক্য মনে করো। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'ভবানন্দের কাছে থাকিও, আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, আমি আশীর্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে'।'

ভবানন্দ বলিলেন, 'সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি!'

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে 'বন্দে মাতরম্' গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল! রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্তে ভবানন্দ মুখে 'বন্দে মাতরম্' গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাদ্য অধিক ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়া নাগরা, ঢাক ঢোল, কাঁসি, সানাই, তূরী ভেরী, রামশিঙ্গা, দামামা আসিয়া জুটিল। জয়সূচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, 'জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চলো যাই, আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি; বিশেষ যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চলো—মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।' তখন সন্তানদল 'বন্দে মাতরম্' বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল। বহু লোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া 'হরে মুরারে' গায়িতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচজনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, 'এতদিনে যেজন্য আমরা সর্বধর্ম সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবন-সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, একদণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কী পরামর্শ দাও?'

জীবানন্দ বলিলেন, 'চলুন, এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।'

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথায়?

জীব। কেন, এই সৈন্য?

ধীর। এই সৈন্য কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। একজনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রামসকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ন হইলেন, বলিলেন, 'যাই হউক, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার করো। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করো এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ করো। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানেরা নিশান উড়াইবে।'

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় তো আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।'

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, 'ছি! আমায় কি শূন্যকুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট

পরাইও কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য ভিন্ন আর কোনও আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্মে যাও।'

তখন চারিজনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিনজন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুইজনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্বদা ভয় কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোনও নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্যোদ্ধার হইল; প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন না সন্তানের কার্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী-কন্যার মুখদর্শন করিবে না। এক্ষণে সন্তানের কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।'

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, 'ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী তো আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে, তা তো জানি না, কোথায়-বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।'

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।' এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, 'কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?'

শান্তি বলিল, 'আমার আশ্রমে আসুন।' এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, 'আমি আসিয়াছি।'

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 'আপনি আসিয়াছেন? কেন?' যে আসিয়াছিল সে বলিল, 'দিন পূর্ণ হইয়াছে।' ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন! আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।'

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে-সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ 'বন্দে মাতরম্' কেহ 'জগদীশ হরে' বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্যপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, 'বলো বন্দে মাতরম্', নহিলে মারিয়া ফেলিব। কেহ ময়রার দোকান লুঠিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ি গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে, 'আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?' সেই একরাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, 'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বলো।' গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, 'মুই হেঁদু।'

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারিদিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহি সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠসকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কী হয় কী হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, 'আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।' মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, 'আল্লাহ আকবার! এত্না রোজের পর কোরানশরিফ, বেবাক্ কি ঝুঁটো হলো; মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে কর্‌তে নারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।' এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ-সকল কথা কল্যাণীর কানে গেল—আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, 'জয় জগদীশ্বর! আজি তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও!'

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না-দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, 'দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।'

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, 'কে যায়?' কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল, 'আমি স্ত্রীলোক।' পাহারাওয়ালা বলিল, 'যাবার হুকুম নাই।'

কথা দফাদারের কানে গেল। দফাদার বলিল, 'বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।' শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল, 'যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন আজকা রাতমে বড় আফত, কেয়া জানে মায়ি তোমার কী হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গির্‌বে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়ে যাবে, সো তো হাম কিছু জানি না, আজকা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।'

কল্যাণী বলিল, 'বাবা আমি ভিখারিনী—আমার এক কড়া কপর্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।'

পাহারাওয়ালা বলিল, 'বয়স আছে, মায়ি বয়স আছে, দুনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হ্যায়! বল্‌কে হামি ডেকেত হতে পারে।' কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ্‌, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাঁটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা দেখিল, মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের দুঃখে গাঁজায় দম মারিয়া ঝিঁঝিট দলে খাম্বাজে শোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে-রাত্রে পথে দলে দলে পথিক; কেহ 'মার মার' শব্দ করিতেছে, কেহ 'পালাও পালাও' শব্দ করিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িল। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতে অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে সে পড়িয়া গেল। তাহারা ঘোর চিৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই-একজন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। একজন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল, বলিল, 'তবে চাঁদ।' সেই সময়ে আর-একজন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, 'তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?'

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, 'সে কী, পদচিহ্নে?' এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, 'হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী!'

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে?'

আগন্তুক বলিল, 'আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরী! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।'

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া তর্জনগর্জন করিয়া বলিল, 'এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম।'

ব্রহ্মচারী বলিল, 'অয়ি স্মিতবদনে! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ওই বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।' এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিলখিল করিয়া হাসিল, বলিল, 'ও পোড়া কপাল! আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও ওই দশা।' শান্তি বলিল, 'ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?'

কল্যাণী বলিল, 'তুমি কে? তুমি-যে সব জানো দেখিতেছি।'

শান্তি বলিল, 'আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ! আমি সব জানি! আজ পথে সিপাহি আর সন্তানের যে-দৌরাত্ম্য, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।'

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'ভয় কী? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চলো পদচিহ্নে যাই।'

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, 'তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।'

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, 'আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখো যে, উহার স্ত্রী আছে।'

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন—এবং তাঁহার বর্তমান বাসস্থানও সর্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পশু-পক্ষী ভগ্ননিদ্রা হইবার পূর্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোনও শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তরতর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত ঊষামুকুটজ্যোতি সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিল, 'আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।'

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, 'আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই—দুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!'

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, 'সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।'

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক-ওদিক চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, 'আমি মেয়ে দিব না।'

নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, 'তা দিদি কাঁদো কেন, এমন দূরও তো নয়—তাদের বাড়ি তুমি নাহয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।'

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, 'তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কী?' নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না-বলিয়া এদিক-ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোঁচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে-সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হ্যাঁ মা—কোথায় যাব মা?' নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল। কল্যাণীকে যে-রাত্রে আপন কুটিরে আনে, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল যে, নবীনানন্দ-যে স্ত্রীলোক, এ-কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিল না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাকিয়াছ কেন?'

ক। পুরুষ সাজিয়া কতদিন থাকিবে? দেখা হয় না—কথা কহিতেও পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ করিতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষে বলিলেন, 'তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণী!'

দুইজনে সেই কথাবার্তা হইতে লাগিল। এদিকে যে-ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন—অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'কী গোঁসাই। সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস?'

মহেন্দ্র বলিলেন, 'ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?'

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত?' বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কী।

ন। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসেবে?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, 'কই, কিসে অবিশ্বাস করিলাম?'

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ি, আপনি সর্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ-সকল কথা তো অপরাধীর কথাবার্তার মতো নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও তো অবিশ্বাসিনীর মতো পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না, বরং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল—সে কি অপরাধিনী হইতে পারে? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন, এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল—মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন—কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?'

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে তো জুয়াচুরি; তুমি স্ত্রীলোক?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন?

শা। সে-কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি-যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। দেখিয়া কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না; বলিল, 'ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্মপত্নী শান্তিদেবী।'

মুহূর্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, 'ইনি ব্রহ্মচারিণী।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ-কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতকগুলা লুঠেড়াতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কত কাল যাইত বলা যায় না; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ কলিকাতার গভর্নর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অগৌণে সন্তানশাসনার্থে Major Edwards নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এড্ওয়ার্ড্স্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যেদিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেইদিনের জন্য সে-স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পরদিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল তো অমনি চারিদিকে 'বন্দে মাতরম্' গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মতো এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে-গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়, অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গনির্মাণ করিয়া, সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণ পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এড্ওয়ার্ড্স্ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া একদিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন, মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ-সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোনও কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজ-সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, 'তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চলো।'

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ একস্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীরদম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নে কিছুদূরে ইংরেজ-শিবির। শান্তি বলিল, 'মরার কথা এখন থাক্—বলো 'বন্দে মাতরম্'।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন দুইজনে কানে কানে কী পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর-এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে, ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এ পুরুষবেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার সজ্জাসকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকণ রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকালপ্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুযুক্ত সিপাহিরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয় ফরমাশ করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্টি দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া চলিয়া যায়; সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার কবে আসিবে?' বৈষ্ণবী বলিল, 'তা জানি না, আমার বাড়ি ঢের দূর।' সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কত দূর?' বৈষ্ণবী বলিল, 'আমার বাড়ি পদচিহ্নে।' এখন সেইদিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহি তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্মভেদী কটাক্ষে সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনিতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'টোমাড় বাড়ি কোঠা বিবি?'

বৈষ্ণবী বলিল, 'আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ি পদচিহ্নে।'

সাহেব। Well that is Padsin—Padsin is it? হুঁয়া একটো গর হ্যায়?

বৈষ্ণবী বলিল, 'ঘর? —কত ঘর আছে।'

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর!—হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আড়মি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ-পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স। একটো কেল্লেমে ডো-চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা?

সাহেব। মেলামে—টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে?

শান্তি। কাল এসেছি সায়েব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, 'তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখব।' প্রকাশ্যে বলিল, 'তা সাহেব, হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষাশিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখিনে।

বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠল, পয়সাটা সিকেটা দাও—উঠে চলে যাই। আর ভালো করে বখ্‌শিশ দাও তো নাহয় পরশু এসে বলে যাব।'

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'পরশু নেহি বিবি!'

শান্তি বলিল, 'দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্‌, বিবি কী?'

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌। পরশু নেহি, আজ রাৎকো হাম্‌কো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরষের তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ ক্রোশ রাস্তা যাব—আসব—ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

এড। ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কয়তা হ্যায়?

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদরেল।

এড্‌। Great General হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও রুপেয়া বখ্‌শিশ দেঙ্গে।

শান্তি। শ-ই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড্‌। ঘোড়ে পর।

শান্তি। ঘোড়ায় চড়্‌তে জানলে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি?

এড্‌। গদি পর লে যায়েগা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা নাই?

এড্‌। ক্যা মুস্কিল, পান্‌শো রুপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিন্ডলে নামক একজন যুবা এন্‌সাইনকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'লিন্ডলে, তুমি যাবে?' লিন্ডলে শান্তির রূপযৌবন দেখিয়া বলিল, 'আহ্লাদপূর্বক।'

তখন ভারি একটা আরবি ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিন্ডলেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, 'ছি, এত লোকের মাঝখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই! আগে চলো ছাউনি ছাড়াই।'

লিন্ডলে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিন্ডলের পায়ের উপর পা দিয়া একলাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিন্ডলে হাসিয়া বলিল, 'তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ারী।'

শান্তি বলিল, 'আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!'

একবার বড়াই করিবার জন্য লিন্ডলে রেকাব হইতে পা লইল। শান্তি অমনি নির্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমতো আসন গ্রহণ করিয়া, ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবিকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিন্ডলে পা ভাঙিয়া পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, 'তবে আমি শীঘ্র গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি।

তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।' তখন দুইজনে দুইদিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার লোক ছিল। শীঘ্র তাহার নিকটে খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিন্ডলে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ বলিলেন, 'An imp of Satan! Strike the tents.'

তখন ঠক্‌ঠক্ খটাখট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মালগাড়িতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু মুসলমান মাদরাজি গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্‌মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেইদিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিল, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবিরসংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছতলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে। ক্ষুধা যেটুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরানীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, 'এইখানেই শিবির করো।' তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছুদূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, 'চলো, টিলায় চড়ো।' নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কেন?'

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চলো এই জোছনারাত্রে ওই পর্বতশিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।' সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন 'হরে মুরারে' উচ্চশব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিল; এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণপূর্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, এ কী এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ আবার কী আনন্দ?'

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, 'আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠবে, তারই জিত।'

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, 'চেনো তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি।'

তুমুল নিনাদে কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, 'চিনি আমরা! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।'

জীব। বলো 'হরে মুরারে।'

কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'হরে মুরারে।'

জীব। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে! দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বলো, 'বন্দে মাতরম্।'

তখন কানন প্রান্তরে ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, 'বন্দে মাতরম্।' ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল—

তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম গুড়ুম গুম্ শব্দে সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত আহত হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র সহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম্ গুম্, দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাষার কর্তনীসম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য 'হুর্‌রে! হুর্‌রে!' শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গিন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্বতবিমুক্ত বিশালতটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয় ব্রিটিশসেনা, পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, 'আজ শেষ। এসো এইখানে মরি।'

মহেন্দ্র বলিলেন, 'মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম নহে।'

জীব। 'আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।' তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, 'কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।'

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, 'অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ করো, জীবন্তে ফিরিবে না।'

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, 'কেহ আসিবে না? তবে আমি একাই চলিলাম।'

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূরে পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাই! নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।'

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। বাম হস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে 'হরে মুরারে! হরে মুরারে!' যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, এ

সাহসে কোনও ফল নাই—তথাপি 'হরে মুরারে! হরে মুরারে!' গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।'

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, 'জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চলো, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।'

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য 'মার মার' শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহিরা যুদ্ধে আর যত্ন না-করিয়া দুইপাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গিন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন, 'সন্তানগণ! ওই দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভনিসূদন কংশকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বলো হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠো! মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মারো! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।'

তখন 'হরে মুরারে'র ভীষণ ধ্বনিতে কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ললিততালধ্বনিসম্বলিত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সর্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতিঘাতপ্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল; সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে, সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুইখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন্ হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি!—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্ গুম্—সর্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ 'হুর্‌রে' বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর,

গৃধিনী। সর্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নিচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে 'মা!' কেহ ডাকিতেছে 'বাপ!' কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান একত্র জড়াজড়ি; জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জোছনালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কী খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। কোথায়, কোন্ নরদেহ মৃত অশ্বের নিচে পড়িয়াছে; সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটি দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায় যে, যাকে খুঁজিতেছি, সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, 'উঠো মা! কাঁদিও না।' শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে জোছনালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূর্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।'

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, 'কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ি দেখ।'

শান্তি শবের নাড়ি টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। সেই পুরুষ বলিলেন, 'বুকে হাত দিয়া দেখ।'

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই; সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, 'নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছুমাত্র নিশ্বাস বহিতেছে কি?'

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

সেই পুরুষ বলিলেন, 'আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙুল দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?' শান্তি আঙুল দিয়া দেখিয়া বলিল, 'বুঝিতে পারিতেছি না।' শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, 'তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।'

শান্তি তখন আবার নাড়ি দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্‌ধক্ করিতেছে! নাকের আগে অঙুলি রাখিল—একটু নিশ্বাস বহিতেছে! মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, 'প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?'

তিনি বলিলেন, 'তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।'

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, 'তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া, রক্তসকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।'

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতাপাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন, তার পর, বারবার জীবানন্দের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যুদ্ধে কার জয় হইল?'

শান্তি বলিল, 'তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম করো।'

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, 'শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষুধের আশ্চর্য গুণ! আমার শরীরে আর কোনও বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চলো। ওই সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।'

শান্তি বলিল, 'আর ওখানে না। মার কার্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কী করিতে যাইব?'

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোনো অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে, 'জীবানন্দ যুদ্ধের সময় প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।'

জী। সে কী শান্তি! লোকের অপবাদভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেননা, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কী হইল। মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ?

জী। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্মে—সে-সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া তো সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য পালন করিব। চলো, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জী। তার পর?

শা। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটির প্রস্তুত করিয়া, দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জোছনাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না-বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।'

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্! আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে-মুহূর্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোনো কার্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।'

সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চলো।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, 'হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?'

তিনি বলিলেন, 'না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।'

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!'

চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয়

না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালোই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ-কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুনো। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে-জ্ঞান, সে-ই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কী, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কী, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনাআপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।'

সত্যানন্দ বলিলেন, 'হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?'

মহাপুরুষ বলিলেন, 'ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেননা, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।'

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করো, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব!'

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চলো, জ্ঞানলাভ করিবে চলো। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কী অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।

বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।